# বর্ডার

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়



অপু বলে উঠল, "বাবা, কবিতাটা মনে আছে? বর্ডার। হায়দ্রাবাদে, এশিয়া সোশাল ফোরামে এডমিরাল রামদাস পড়েছিলেন।"

মনে পড়ল। আমরা বসেছিলাম ওয়াঘা বর্ডারে। একটু আগে দেখেছিলাম, ওয়াঘায় ভারত - পাকিস্তান সীমান্তে, সূর্যাস্তের পূর্বে, দুই দেশের রক্ষীদের কুচকাওয়াজ। রামদাস হলেন ভারতের প্রাক্তন নৌ সেনাধ্যক্ষ। এশিয়া সোশাল ফোরামের সভায় কবিতাটা শোনার পর, অপু (তার বয়স তখন বার বছর) তাঁকে গিয়ে বলেছিল, "কবিতাটা আর একবার বলবেন? টুকে নেব।" রামদাস আস্তে আস্তে বলে চললেন, আর অপুও লিখে নিয়েছিল তার খাতায়।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম কবিতাটার কথা। অপু বলতে মনে পড়ল, কি সহজ অথচ কী গভীর কবিতাটার কথাগুলি। "বর্ডারের উপর দিয়ে যে পাখিটি উড়ে যায়, সে কি জানে, যে কোন গাছটাতে সে বসবে? এইধারে না ওইধারে? আর সীমান্ত নির্দেশ করে যে খুঁটিটা দাঁড়িয়ে আছে, আর বড় জ্বালা, সে বেচারা জানে না, সে এধারের না ও ধারের।"

এই ধারের রক্ষীদের নির্দেশমত আমরা বর্ডার ধরে হেঁটে গিয়ে বসলাম আমাদের গ্যালারিতে। তখন দেখি, ওই ধারের গ্যালারিতে বসে আছেন পাকিস্তানের মানুষ। সীমান্তের ওই পাড়ে দাঁড়িয়েছিল দুই পাকিস্তানী ঘোড় সওয়ার ও তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন কোন পাকিস্তানী ভি. আই. পি./ আমি যে বিদেশে পাকিস্তানীদের সঙ্গে মিশিনি তা নয়। আমাদের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আলাদা, তাই আমরা আলাদা। তা ছাড়া? কিন্তু আজ ওই পার্থক্যটুকু প্রমানের জন্যই যে দাঁড়িয়ে আছে বর্ডারে, ওই খুঁটি সমেত কাঁটা তারের বেড়া। তা না হলে আমরাও তো বর্ডারের পাখির মত হতে পারতাম।

বর্ডারের দু'ধারেই যে যার দেশের উদ্দেশ্যে জয়ধবনি তোলে কিন্তু কৌতূহল ভরে চেয়ে থাকে বর্ডারের ওপারে, দেখতে যে ওপারের মানুষ কি করছে। তারপর হঠাৎ খুলে যায় দুই দেশের নিজস্ব প্রবেশদ্বার, আর নো - ম্যান্স ল্যান্ডে (নিরপেক্ষ ভূমিতে) প্রবেশ করে, একে অপরকে স্যালুট করে, করমর্দন করে দুই দেশের রক্ষী সেনানী। তখন স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে ফেটে পড়ে দুই গ্যালারিতে সমবেত, দুই দেশের মানুষ।

কুচকাওয়াজ হয় নানান রকম। তারপর বিউগল বাজার পর অনুরোধ আসে যে পতাকা নামানোর সময় যেন কোন রকম স্লোগান দেওয়া না হয়। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে দুই দেশের দুইটি পতাকা নামিয়ে, হাতে নৈবেদ্যর মত ধরে, ফিরে যায় দুই দেশের রক্ষী।সেটা কি সূর্যাস্তের পূর্বে, তখন সবে ঝিকিমিকি বেলা।

এতক্ষণ অবধি বর্ডারের দুই ধারের জনতাকে যথেষ্ট কন্ট্রোলের মধ্যে রাখে দুই দেশের রক্ষীসেনানী। কিন্তু উপরোক্ত অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও নিয়ন্ত্রণের রাশ ঢিলা করে দেন। তখন সাধারণ জনতাকে অনুমতি দেওয়া হয়, ওই নো ম্যান্স্ ল্যান্ডের সীমানাবর্তী গেট অবধি যাবার। দেখলাম, দুই দেশের জনতাই ছুটে গেল। ভিড় সামলাতে পারলাম না বলে গেলাম না। কিন্তু দেখলাম, দুইটি গেটের ফাঁক দিয়ে, দুই দেশের মানুষ শুভেচ্ছা ও সৌজন্য বিনিময় করে চলেছে।

ওই দৃশ্য দেখে যখন ফিরছিলাম বাণীকে নিয়ে, তখন পাকিস্তানী সীমানার পিছনে ফিকে লাল রং-এর গোধূলি নেমে এসেছে। মনে পড়ে গেল, আজ থেকে সাতান্ন বছর আগে ওই রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে কত রক্ত আর এপার - ওপার পারাপার করে গেছে কত আত্মীয় স্বজন হারা, গৃহহারা, সহায় সম্বলহীন শরণার্থী। ফিরতে ফিরতে বাণী বলে উঠল,

"অপু, আলো গেল কোথায়?"
একটু পরেই ওরা ফিরল। আলো হাতে একটা ছোট্ট ফুল দেখিয়ে বলল, "বাবা, দেখ পাকিস্তানের ফুল।"
দেখলাম ফিকে হলুদ রং - এর একটা ফুল। অপু বলে উঠল, "হলুদ বনে কলুদ ফুল। পাকিস্তানের।"
বললাম, "কে দিল?"
আলো আমাকে বুঝিয়ে বলল, "কাঁটাতারের বেড়ার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, দেখলাম ওপারে একটা গাছ নুয়ে পড়েছে।তারই ফুল, ঠিক বর্ডারের পাখির মত।"
আমার মনে পড়ে গেল কয়েকটা ঘটনার কথা। প্রায় বছর পনের আগে, একবার আমি গিয়েছিলাম, ফ্রান্সের দক্ষিণে, করসিকা নামক দ্বীপে। কারজেস্ নামে এক ছোট্ট সমুদ্রবর্তী গ্রামে। করসিকার নাম আপনারা শুনে থাকবেন, নেপোলিয়নের জন্মস্থান ওখানেই। ছিলাম সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ। রোজ সন্ধ্যায় ঘুরে ঘুরে খেতাম নানান রেস্তোরাঁয়। খোলা আকাশের নীচে রেস্তোরাঁয় বসতাম আর সমুদ্রের দৃশ্য উপভোগ করতাম। এক সন্ধ্যায় খেয়ে ফিরছি, হঠাৎ পিছন থেকে শুনলাম একটা ডাক, "ভাই সাব, আপলোগ হিন্দুস্থানী হ্যাঁয়?"
পিছন ফিরে দেখি, প্রায় বিশ - বাইশ বছরের এক শ্বেতাঙ্গ যুবক, এক শ্বেতাঙ্গিনী যুবতীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে। ইউরোপীয় যুবকের মুখে হিন্দি শুনে, আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, " জী হাঁয়, কিন্তু আপনি বুঝলেন কি করে?"
ছেলেটি বলল, "চেহারা তো বটেই, তাছাড়া আপনাদের ইংরিজি উচচারণে বুঝলাম। আপনার বন্ধুর উচচারণ তো ছাপমারা সাউথ ইন্ডিয়ান। আমার ইন্ডিয়ান বন্ধু অনেক আছে। আমি হিন্দুস্তানী নই। আমি হলাম সুইস্।"
বললাম, "সুইস্ হয়ে এমন সুন্দর হিন্দি বলছ কিভাবে?"
এবার যা বলল, তাতে আরও আশ্চর্য হলাম। বলল, "আপ নে রামপুর কা নাম সুনা হোগা। শিমলা সে সত্তর কিলোমিটারদূর হ্যায় রামপুর। মেরা ওয়ালিদ সাহব কা (বাবার) খানদান ওঁহি কে হ্যায়।"
জিজ্ঞেসা করলাম, "এখন ওখানে কে কে আছেন?"
বলল, "আমার বাবার খানদানের তো কেউ নেই ওখানে আর। ওঁরা ছিলেন মুসলমান। আপ নে ফিরোজ খাঁ নুন্ কা নাম সুনা হোগা? উয়োহ্, থে মেরা ওয়ালিদ সাহব কা চাচা, ফিরোজ খাঁ নুন্ পাকিস্তান কা ওয়াজির-এ আজম ভী বনে থে, শায়দ উন্নিস সোপচপন মেঁ।"
আমি আর কিছু বললাম না। ফিরোজ খাঁ নুন্ একসময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরও হয়েছিলেন। তাঁর অগণতান্ত্রিক শাসনের ফলে সেখানকার মানুষের আস্থা বা শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু সে বিতর্কের সময় তো এখন নয়।
তারপর ছেলেটি তার সঙ্গিনীর দিকে ফিরে কি যেন বলল, মেয়েটি সম্মতি জানাতে আমাদের বলল, "চলুন, একটু বসা যাক। আমাদের ডিনার এখনো হয় নি, কিন্তু আপনাদের হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, যেভাবে খড়কে চিবুচ্ছেন। অন্তত একপাত্র ওয়াইন না খাইয়ে ছাড়ছি না। চলে তো ওসব? না, না আমার বান্ধবী কিছু মনে করবে না, ও সব কিছু মানিয়ে নেয়।" তারপর মেয়েটিকে একটু কাছে টেনে নিয়ে সে বলল, " আর ওদিককার মুলুকের মানুষের সঙ্গে কথা বলে আমি যে আনন্দ পাই, তাতে ওরও আনন্দ হয়। আর হ্যাঁ,এখন আর ইংরিজি নয়। আর ইংরিজি বললেও ওর বিশেষ সুবিধে হবে না। ও হল ইতালিয়ান, ওর ইংরাজিটা তেমন সড় - গড় নয়।"
আমি মেয়েটির দিকে ফিরে অনুমতি চাইলাম, "পার মেস্নো। অনুমতি কণ।"
মেয়েটি ঘাড়টাকে নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে বলল, "প্রেগো।" অর্থাৎ, ....?
বসলাম একটা ছোট সরাইখানায়। ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে ছেলেটি তার কাহিনী শোনাল। দুঃখের বিষয়, ছেলেটির নাম আজ ভুলে গেছি, মেয়েটির নাম ছিল মারিনা। টিপিকাল ইতালিয়ান নাম। ছেলেটি বলল, "আমার জন্ম এক অভিজাত বংশে। ফিরোজ খাঁ নুন ছিলেন, যতদূর জানি আই. সি. এস। আমাদের পরিবাড়ের সবাই উচচশিক্ষিত। দেশভাগের পর দাঙ্গার সময় সবাই পাকিস্তানে চলে আসেন। পাকিস্তানই হয়ে ওঠে আমাদের দেশ, আশা, ভবিষ্যত, সবই। কিন্তু অতীত কি ভোলা যায়? আমার বাবা ছিলেন দিল্লীইউনিভাসিটির গ্রাজুয়েট, পড়েছিলেন সেন্ট স্টিফেন্সে। শিমলা, দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ আর এলাবাহাদের কত গল্পই শুনেছি তাঁর মুখ। তাঁদের সবার আশা ছিল যে দাঙ্গা মিটলে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, আবার যাতায়াত শু হবে। কিন্তু তা আর হল না। আমার বাবা উচচশিক্ষার্থে চলে আসেন ফ্রান্সে, আর এদিকেই থেকে য

ান। ভারত আর তাঁর দেখা হয় নি। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে।"
আমি বললাম, "তোমার এত সুন্দর হিন্দি, বাবা শিখিয়েছেন বুঝি?"
আমাকে অবাক করে ছেলেটি বলল, "বাবা, মা দুজনেই। জানেন তো, আমার মা সুইস্ বটে, কিন্তু উর্দুটা আমার চেয়েও ভাল। একটু ফিরিঙ্গী টান আছে বটে, ওনার উচচারণে, কিন্তু উনি উর্দু ভাল লিখতে - পড়তে জানেন, আমি পারি না। বাব া - মা'র দুজনেরই ইচছা ছিল যে শেষে লাহোরে বসবাস করবেন। কিন্তু ওখানকার অবস্থা বোঝেন তো? যে যার আখের গুছিয়ে নিচ্ছে পলিটিশিয়ানদের ধরে, আর সমাজের এলিট হলে তো আর কথাই নেই। আমার বাবা ছিলেন ওই সব ক াজের অনুপযুক্ত ও তাঁর সে প্রবৃত্তি - ও ছিল না। মাঝে মাঝে ঘুরে এসেছি আমরা পাকিস্তানে, আত্মীয়দের সঙ্গে অনেক অ ানন্দ করেছি। আমার মায়ের উৎসাহ থাকলেও বাবা মাথা হেঁট করে ফিরতে চান নি আর আমার মা - ও জোর করেন নি। তাই আজ আমি সুইস্। আমি যেমন লাহোর ঘুরে আসি, তেমনি দিল্লী, শিমলাও দেখে এসেছি। এই তো সামনের শীতে মা রিনাকে নিয়ে যাব। বুঝলে, মিয়া - কারা (আমার প্রিয়া) ণারিনা সুন্দরী এই বেলা একটু হিন্দি আর ইংরাজি শিখে নাও, ন া হলে আমাকে দোষভাষীর কাজ করে যেতে হবে। সে ঠ্যালা কদ্দিন সামলাব? আমার মাকে দেখেছ তো?"
মেয়েটি মৃদু হেসে সম্মতি জানাল, "সি। ইয়েস্। হ্যাঁ আমি শিখব।'
ছেলেটি বলে চলল, "জানেন তো, আমার বাবা ওই বর্ডার পেরতে পারেন নি। আপনারাও পারবেন না। আমার কিন্তু ওই বর্ডার পেরতে কোন বাধা নেই, কারণ আমি হিন্দুস্তানী নই বা পাবিস্তানী নই।
একসময় আমাদের উঠতে হল। তাদের দুজনকে শুভেচছা জানিয়ে বললাম, "আমার কাছে এমন কিছুই নেই, যে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তোমাদের দেব। তোমার মাকে আমার সালাম জানিও। তুমি যে বারবার ওই বর্ডার পেরতে পার।"
ছেলেটি বারবার বর্ডার শব্দটি ব্যবহার করল বলে তার কথা আজ আমার আবার মনে পড়ল। কিন্তু একবার বর্ডারের দাঁ ড়িয়ে আমারই একটা অসামান্য অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, সেটা আজকের "হলুদ বনে কদুল ফুলেরই' মত।
গিয়েছিলাম ত্রিপুরায় বছর তিনেক আগে ও ছিলাম দু'সপ্তাহের মত। ফিরছিলাম নীরমহল দেখে ও দাঁড়ালাম কমলনগরে, কমলা সাগরের ধারে কসবা কালীমন্দির দেখতে। সঙ্গে ছিলেন আমার বন্ধু মানিকলাল ধর, ছোট গল্প লিখিয়ে হিসাবে খ্যাতি আছে তাঁর। মানিকবাবু কৌতুকের সুরে বললেন, "একটা মজার জিনিস দেখাই আপনাকে। জ ানেন তো, ওই পুকুরটার জলের ওই ধারটা হল 'পানি' আর এই ধারটা হল "জল'। র‍্যাড্ক্লিফ্ সাহেব এমনই জ্ঞানী ও বিপজ্জনক, যে তিনি জানতেনও না, যে তিনি দাঁড়ি কাটাছেন একটা পুকুরের উপর দিয়ে। বুঝুন এবার পুকুরের মাছগুলে ার অবস্থা, তারা কখনো চলে যেত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আর কখনও বাআবার ভারতে। আর এই মীমাংসায় সহচেয়ে বড় বাধা হল, দুই দেশের সাম্প্রদায়িক দলগুলো, গেয়া আর সবুজ, একে যেন অপরের দোসর।"
পুকুরের ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল, যে ওপারের প্রায় সীমান্ত বরাবর চলে গেছে একটা রেল লাইন, আর স ামনেই হল একটা স্টেশন। জানি না কেন, চিরদিনই আমাকে টানে রেলগাড়ি ও রেল লাইন। দেখলাম, ওই রেল লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাদা কাশফুল সমেত একটা কাশবন। সত্যজিত রায়ের 'পথের পাঁচালি' যদি দেখে থাকেন, তবে অ ামার অনুভূতিটা বুঝতে পারবেন সবাই। আর আমিও বিভূতিভূষন নই। তাই বর্ণনার চেষ্টাও করব না।
মানিকবাবুকে (মানিক ধর, সত্যজিত বাবুরও নাম ছিল মানিক  সেই মহাপ্রতিভার সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁর ফিল্ম ও লেখ ার মাধ্যমেই) বললাম, "চলুম, একটু দেখে আসি রেললাইনটা।"
আমাদের পথ আটকে দিল বর্ডারে কাঁটাতারের বেড়া। ওপারে হল বাংলাদেশ। সেখানেই বন্দুক হাতে দাঁড়িয়েছিল বি. এস্. এফ্. এর এক জওয়ান। বলল, সে হল গুজরাতি, এর আগে তার পোস্টিং ছিল তার নিজেরই প্রদেশে, ওই কচ্ছের র ান-এ। বললাম, "তফাৎটা কেমন বুঝছেন ভাই?" সে বলল, "আপনিই বলুন না। আগে পাহারা দিতাম বালির স্তূপ, অ ার এখানে, এই পুকুরের জল।"
জিজ্ঞাসা করলাম, "ওই লাইন দিয়ে ট্রেন যায় কখন?" বলল, "টাইম তো প্রায় হয়ে গেছে। যাবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম।"
তার অল্পক্ষণ পরে ট্রেনটা যখন এল, আমরা কৌতুহল ভরে দেখলাম তাকে ছুটে যেতে। ট্রেনতো তো চলে গেল, আমরাও ভাবছি ফিরব, এমন সময় দেখলাম যে বর্ডারের ওপার থেকে দুটি কিশোর তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ইশারায় ড াকতে তারা এল,এই কাশবন পেরিয়ে কাঁটাতারের বেড়া অবধি। "আসালাম ওয়ালেকুম, স্যার।" আমরাও বললাম,

“ওয়ালেকুম সালাম।”
প্রীতি সম্ভাষণ বিনিময় করলাম আমরা। দু জনেই ছাত্র, ইন্ডিয়ায় এসে পড়াশুনা করতে চায়, আই. আই. টি. তে বা যাদবপুর, শিবপুরে চান্স পেলে তো বটেই।
দু-চার কথার পর আমরা বললাম, “চলি তা হবে।”
তারা বলল, “স্যার, চা খেয়ে যাবেন না?”
আমরা বললাম, ‘খেতে পারি, কিন্তু পাব কোথায়?”
তারা বলল, “দাঁড়ান, ওই তো স্টেশন। আমরা নিয়ে আসছি। চলে যাবেন না, স্যার।”
তারা ফিরে এল। দুহাতে দু গ্লাস চা। কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল আমাদের হাতে। পরম তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে খেলাম বর্ডারের ওপারের চা। যাবার সময় আমরা ঠিকানা বিনিময় করলাম। বাঙ্গালোর ফিরে চিঠিও দিয়েছিলাম, কিন্তু উত্তর পাইনি।
ওয়াঘা বর্ডার থেকে ফিরে এই কথাগুলো যখন ভাবছি, তখন টেলিভিশনে ফুটে উঠল যে শ্রীনগর - মুজফ্ফরাাদ বাস ও মুজফ্ফরাবাদ - শ্রীনগর বাস যাত্রীদের নিয়ে নিরাপদে পৌঁচেছে। হয়তো বা ত্রিশ চল্লিশ বছর বাদে এপার বুকে জড়িয়ে ধরেছে ওপার কে ও ওপার এপারকে।
বর্ডারের ওপারে ফোটা ফুলটিও তার রেণু ছড়িয়ে দেয় এপারের ফুলকে আর এপারের ফুল দেয় ওপারের ফুলকে। সেই রেণু বয়ে নিয়ে আসে বাতাস, মৌমাছি আর পশু - পাখি। না আছে তাদের পাসপোর্ট, না লাগে তাদের ভিসা। বন্ধুদের মধ্যে হৃদয়ের অনুভূতি, তাকেই বা আটকাবে কোন বর্ডার!



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com